আম্পানের তাণ্ডব ও পরবর্তী করণীয়

তিন-চার সপ্তাহ আগে আমার সহকর্মীকে বলছিলাম যে, 'দুর্ভাগ্য কখনো একা আসেনা'। তাই বাংলাদেশ আর কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে সেটি বড় চিন্তার বিষয়। যেমন, হাওড়ের ধান যদি ডুবে যায়, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যদি করোনা ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা জেলখানাগুলো যদি করোনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি দেখা দেয়। দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় আম্পান এসে আমাদের এক বিরাট এলাকা তছনছ করে দিয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে মনে হয়েছে যে, এটি ভারত এবং বাংলাদেশ অংশে আঘাত হানতে পারে। তখন আশায় ছিলাম যে, তাহলে অন্তত সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে গেলে আমাদের দেশের ক্ষতি কিছুটা হলেও কম হবে। আশা করেছিলাম যে, হয়তো জীবনহানি ১০-১২ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সম্পদের ক্ষতি সীমিত আকারে হবে। তবে জীবনহানি সীমিত হলেও সম্পদ হানির ক্ষেত্রে এবারের ঘূর্ণিঝড় একটু বেশি এলাকার উপর দিয়ে গেছে এবং সে কারণে দণ্ডয়মান শস্য, গাছ-গাছড়া এবং বসতবাড়ির ক্ষতি কেবল কম করে নাই। তবে যদি সুন্দরবনের দিক দিয়ে না আসতো এবং সরাসরি গ্রাম এলাকায় আঘাত হানতো তাহলে প্রাণহানি এবং সম্পদহানির পরিমাণ অনেক বেশি হতে পারতো। ভারতের অবস্থা দেখে আরো সহজে অনুমান করা যায় যে, এর তাণ্ডব কতটা হতে পারতো। তারপর আমাদের দেশের মুসলমানদের পবিত্র রজনী লাইলাতুল কদরের রাতে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

যাইহোক ঝড়ের আগেই বলেছিলাম যে, এবার আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ মাঠে আছে; সুতরাং যতটা সম্ভব তারা ক্ষতি এড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু করোনা আবার এক রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেক জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকরা অনেক চেষ্টা তদবির করে এবং করোনার ঝুঁকির মধ্যে তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিতে পেরেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি অনেক বেড়েছে এবং সেভাবে বিভিন্ন গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ এবং জনবল ও সরঞ্জাম সংগ্রহ আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আরো বেশি উদ্ধারকারী সরঞ্জাম সংগ্রহের দরকার আছে। এর মধ্যে অনেক কিছু চলমান আছে এবং প্রতি বছর সে সব সংগ্রহ অব্যাহত আছে। এ ছাড়া কয়েক বছর আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর একটি সফটওয়ার তৈরি করেছিল যাকে বলা হয় ডিএনএ বা ডিজাষ্টার নিডস অ্যাসেসমেন্ট সফটওয়ার।

এটিতে প্রতিটি উপজেলা থেকে দুর্যোগের কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ইনপুট আকারে দিলে সরাসরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে চলে আসবে। অর্থাৎ দুর্যোগের কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটি রিপোর্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হাতে আসবে। সাথে সাথে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি পেয়ে যাবে। তবে সেটি এখন সক্রিয় আছে কিনা তা বলা মুশকিল কারণ আমাদের দেশে কোনো কিছু আমরা অর্জন করলেও তা সব সময় ধরে রাখতে পারি না বা কার্যকর রাখতে পারি না। কারণ ঐ সফটওয়ারটিতে প্রতিবছর নিয়মিত এলাকার সম্পদের হালনাগাদ তথ্য দিতে হয় যাতে তার ক্ষতি কতটা হয়েছে তা যেন সহজে চিহ্নিত করা যায়।

যেমন, কোনো উপজেলায় গরু দেখানো আছে ১ লক্ষ তাহলে তা যদি আপডেট করা না হয় আর যদি তিনি লিখতে চান যে, গরু মারা গেছে ২ লক্ষ তা হলে সে ডাটা আর সফটওয়ারে নিবেনা কারণ স্টক আছে ১ লক্ষ আর মারা গেছে ২ লক্ষ। এখন প্রযুক্তি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনেক কাজে লাগছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রাণহানি ও সম্পদহানি নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কিন্তু তার ব্যবহার আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করতে হবে।

বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রাণহানি রোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ প্রাণের কোনো বিকল্প নেই, সম্পদের বিকল্প আছে। সম্পদ মানুষ তৈরি করতে পারে কিন্তু প্রাণ তৈরি করতে পারেনা। আমার কাছে প্রতিটি মানুষ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ; একজন মন্ত্রী, সচিব কিংবা বুদ্ধিজীবী যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একজন কৃষক, জেলে, ক্ষেতমজুর, ভ্যান চালক, গ্রামের সংবাদকর্মী- এক কথায় প্রতিটি মানুষ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জন্য প্রতিটি মানুষ দরকার। কৃষক জমিতে ফসল ফলায়, জেলে মাছ ধরে; তারা তা না করলে আমরা খাবো কি।

শ্রমিক উৎপাদন না করলে রাজস্ব আসবে কোথা থেকে, দেশ চলবে কিভাবে; স্বল্প শিক্ষিত একজন সংবাদকর্মী যদি কাজ না করে, দেশের মিডিয়া চলবে কিভাবে? এভাবে প্রতিটি মানুষ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনে বসে কাজ করার সময় দেশের একজন প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদ আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, উপকূলে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে কি লাভ; তাতে মাত্র ১৫০-২০০ সাধারণ মানুষ বাঁচতে পারে? খুবই কঠিন প্রশ্ন ছিল। তিনি ডাকসাইটে

অর্থনীতিবিদ, হার্ভাড-এর নোবেল লরিয়েটদের ছাত্র, আমি সমাজবিজ্ঞানী। তিনি সবকিছু দেখেন দেশের অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান হিসাব করে, সেটাই স্বাভাবিক। আমি একটু ভেবে সাথে সাথে বললাম যে, আর্থিকভাবে দেখলে হয়তো আপনার যুক্তি ঠিক আছে কিন্তু আমার এর পক্ষে ভিন্ন যুক্তি আছে।

আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণকামী রাষ্ট্র, প্রতিটি মানুষকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, সেবা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, উপকূলে যদি লোক এভাবে মারা যায় তাহলে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করবেনা এবং বিনিয়োগকারীরাও উপকূলে বিনিয়োগ করতে চাইবেনা। শেষ পর্যন্ত দেশের একটা বড় অঞ্চল অনুন্নত থেকে যাবে। এছাড়া বৃদ্ধ লোকগুলিকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাদের রেখে কি লাভ হয়? আমার এভাবে দেয়া আর্থ-সামাজিক যুক্তিগুলো তিনি মেনে নিলেন এবং উপকূলে আরো আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করলেন।

গত ২১-৫-২০২০ তারিখে যে ঘুর্ণিঝড় হয়েছে তাতে বেশ কিছু প্রাণহানি হয়েছে এবং প্রাথমিক হিসাবে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবে তা আরো বাড়তে পারে।

তাই সে ক্ষতি অন্তত কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠার জন্য যে-সব ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা হল- (১) প্রতিটি নিঃস্ব পরিবার নূন্যতম খাদ্য সাহায্য যেন পায় যারা এখন পাচ্ছেনা; (২) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নগদ কিছু অর্থ সাহায্য দেয়া দরকার; (৩) কিছু ক্ষতি চলমান করোনা মোকাবিলার পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যেমন কৃষকদের যে সব ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে ফসল, মৎস্য, পশু ইত্যাদি; (৪) যেগুলো করোনার পরিকল্পনার বাইরে থাকবে তাদের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনা করা; (৫) যেসব প্রাণহানি হয়েছে তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার (গড় আয়ু ৭৩ বছর ধরে বেঁচে থাকলে যত টাকা আয় করতেন কমপক্ষে তার সমপরিমাণ); (৬) যে সব অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেমন স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট সেগুলোর জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা; (৭) এনজিওগুলো থেকে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা; এবং (৮) আমপান ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প নেয়া।

মনে রাখা দরকার এ ক্লান্তিলগ্নে কৃষক বাঁচলে অর্থনীতি বাঁচবে। কারণ এ মুহূর্তে কৃষিকে যেভাবে হোক সতেজ রাখতে হবে। তা নাহলে আগামী ১ বছরের মধ্যে এমনকি অর্থ থাকলেও বিশ্ব বাজারে খাদ্য পাওয়া নাও যেতে পারে। যাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে আউসসহ অন্য জরুরী ফসল করার জন্য বীজ, সার এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সহায়তা দেয়া দরকার। কোনোভাবে খাদ্য সংকটের ঝুঁকি নেয়া যাবেনা। এবং সম্ভব হলে কিছু উদ্বৃত্ত খাদ্য পণ্য বিদেশে বিক্রয়ের জন্য তৈরি করতে পারলে আরো ভালো হয়। এসব ক্ষতি যথাযথভাবে নির্ণয় করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট